



“ভালোবাসি” হয়নি বলা

একটি স্মৃতিনির্ভর আবেগঘন গল্প

“কিছু কথা উচ্চারণ না করলেও হৃদয়ের গভীরে তারা আজীবন ধ্বনিত হতে থাকে”

লেখক: লিয়াকত হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা





প্রস্তাবনা: অব্যক্ত ভালোবাসার নীল সকাল

জীবনের কিছু স্মৃতি আছে, যেগুলো সময়ের ধুলোয় মুছে যায় না; বরং যত দিন যায়, ততই তারা বুকের ভেতর নতুন করে আলো-ছায়ার খেলা শুরু করে। প্রথম ভালোবাসা তেমনই এক স্মৃতি—যার কাছে যুক্তি হার মানে, বয়স থমকে দাঁড়ায়, আর হৃদয় ফিরে যায় সেই কিশোর বয়সের কুয়াশাভেজা সকালের কাছে।

এই গল্পটিও এমনই এক অব্যক্ত ভালোবাসার গল্প। এখানে আছে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ স্কুলপথ, শীতের কুয়াশা, ভোরের ঘুমভাঙা পাখির ডাক, এক মায়াবী কিশোরীর হাসি, বাড়-বৃষ্টির এক আশ্রয়হীন বিকেল, আর আছে একটি চিঠি—যে চিঠি লেখা হয়েছিল হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, কিন্তু পৌঁছাতে পারেনি প্রিয় মানুষের হাতে।

লাইজু নামের মেয়েটি হয়তো পৃথিবীর চোখে ছিল খুব সাধারণ; কিন্তু এক কিশোর হৃদয়ের কাছে সে ছিল ভোরের প্রথম আলো, বসন্তের প্রথম কোকিল, আর নীল আকাশে ভেসে থাকা এক বিন্দু মায়ী।

এক. শীতের সকাল, স্কুলপথ ও প্রথম থমকে যাওয়া

তখন আমি মাধ্যমিক স্কুলে পড়ি। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার। শীতের দিনগুলোতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিন শুরু করতে হতো, নয়ত সময় মত ক্লাসে পৌঁছান হতো না। তাইতো প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে মনিং ওয়ার্ক শেষে প্রস্তুতি নিতাম স্কুলে যাওয়ার। সময়মতো গাড়ি পাওয়া গেলে ভাগ্য ভালো, আর না পেলে সেই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হতো। কখনো কখনো গাড়ির অপেক্ষা করতে করতে এমনও হয়েছে—স্কুলে যাওয়াই বাতিল করতে হয়েছিল।

ঠিক তেমন-ই একটি সকাল এলো। গাড়ির অপেক্ষা করতে করতে স্কুলের সময় শেষ। আমি বাড়ির পথ ধরলাম, বাড়ির কাছেই ছিল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়; সেই বিদ্যালয়ের করিডোর পার হয়েই আমাকে ফিরতে হতো বাড়িতে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো, অন্য রকম এক অনুভূতি, ভালোলাগা, এ যেন প্রিয় ফুলের সুঘ্রাণ, যেন কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে মন চায় সারাক্ষণ, আকাশের ঝকঝকে রোদ যেন হিমেল হাওয়ার পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে “লাইজু”। জানতে চাইলঃ ভাইয়া কেমন আছেন? স্কুলে যাননি? ওহ বুঝতে পেরেছি আজ গাড়ি পাননি, তাই না? “ও” একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছে আরে আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এর আগে আমি ওকে বহুবার দেখেছি, কথা বলেছি, হাসি-ঠাট্টাও করেছি, কিন্তু সেদিনের দেখাটা ছিল অন্যরকম। তার চোখে যেন ভোরের শিশির জমেছিল, মাথার চুলগুলো যেন কৃষ্ণচূড়ার শাখা প্রশাখার মতো মেলেছিল, ঠোঁটের কোণে জমে ছিল মায়াবী হাসি, যা কিশোর হৃদয়কে বিনা অনুমতিতে বন্দি করার জন্য যথেষ্ট।

সব শেষে আমি শুধু বললাম- ‘ভালো, খুব ভালো।’ অথচ একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করলাম না “তুমি কেমন আছ?” যেন ভুলে গেলাম সবকিছু। সেই ভুলটুকু তখন ছোট মনে হলেও পরে বুঝেছি, কখনো কখনো জীবনের বড় আফসোস শুরু হয় এমন ছোট নীরবতা থেকেই।



লাইজু আবার জানতে চাইল, ‘ভাইয়া আপনাদের স্কুলে কি আমাকে ভর্তি করে দিতে পারবেন? ভাইয়াকে বলেছি কিন্তু রাজি হয়না। নাকি আপনিও চাইছেন না? আমি হেসে উত্তর দিলামঃ “না”। সে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল ‘কেন?’ আমি দুট্টমির ভঙ্গিতে বললাম, “তোমার মতো সুন্দরি, মায়াবীর কোমল ঠোঁটের হাসি দেখার মতো সৌভাগ্যবান ছাত্র আমাদের স্কুলে নেই তো, তাই।’

“ও” লজ্জা আর হাসি মাখা মুখে বলল, ‘ভাইয়া, আপনিও! তারপর ঠোঁটে হাসির পরশ রেখে বিদায় নিল লাইজু। সেই বিদায়ের পর থেকেই মনে হলো, আমার মনের ভেতরে কোনো অচেনা পাখি তার ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে।

দুই. হৃদয়ের জানালায় নতুন আলো

বাড়ি ফিরে মন আর স্থির থাকল না। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠছিল ওর মুখ, ওর হাসি, আর ক্ষনিকের জন্য হারিয়ে যাওয়ার সেই মুহূর্তগুলো। এতদিনের পরিচিত মেয়েটি হঠাৎ কেন এত আপন হয়ে উঠল, তার কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না নিজের কাছে। শুধু মনে হচ্ছিল—হৃদয়ের জানালায় কেউ একজন নীরবে এসে দাঁড়িয়ে আছে। (লাইজু আমার এক কাছের আত্তিয়, কাজিনা ওর বাবা মা আমাকে অনেক ভালবাসতেন, আদর করতেন তাদের নিজের ছেলের মতো অন্যদিকে ওর বড় ভাই আমাকে শুধু ভাইনা শিক্ষাগুরু মত মানত)।

এরই মধ্যে লাইজু আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া আশা করে, আবার মাঝে মধ্যে আমরা একই সাথে যাই, সাথে আরো অনেকে এখান থেকে যায়, আর বাসস্ট্যান্ড এর পাশেই ছিল লাইজুদের বাড়ি।

প্রতিদিনের মতো আরেক সকালে একই বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িলাম গাড়ির জন্য। গাড়ি সময়মতো এল না, তাই হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের পথে বের হলাম। পথ চলতে চলতে বারবার মনে হতে লাগল অনেক কথা, জানতাম “ও” আমাকে কিছু বলতে চায় আবার আমিও ওকে কিছু একটা বলতে চাই, কিন্তু কিভাবে বলব! চিঠি লিখব? নাকি অন্য কিছু, কিভাবে জানাব? আবার বৃকের ভেতর কেঁপে উঠল অজানা ভয়, যদি সে না করে, যদি ভুল বোঝে, যদি এই কারণে ওদের ফামিলির সাথে আমার যে ভাল সম্পর্ক তার যদি কিছু হয়, ইত্যাদি।

ভাবতে ভাবতে কখন স্কুলের করিডোরে এসে দাঁড়িয়েছি, নিজেই টের পাইনি। সামনে তাকাতাই দেখলাম, ক্লাসরুমের দরজার পাশে এক অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লাইজু। আকাশ তখন রৌদ্রোজ্জ্বল, উত্তরের বাতাসে শীতের মৃদু স্পর্শ। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। মনে হলো, গোলাপের সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে বেলি ফুলের মিষ্টি সুবাস আমার দিকে ভেসে আসছে।

সেদিনের ক্লাস চলল যথারীতি। কিন্তু মন ক্লাসে ছিল না। অক্ষরগুলো চোখের সামনে এলেও অর্থ হারিয়ে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল, লাইজুর একটি হাসিই যেন আমার সারাদিনের পাঠ্যবই।

তিন. ঝড়ের বিকেল, তালগাছের ছায়া

দুপুর শেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। হঠাৎ চোখ পড়ল উত্তর আকাশে—কালো মেঘের ভেলা পাহাড়ের মতো জমে উঠছে। ঘীরে ঘীরে চারদিক অন্ধকার হতে লাগল, সূর্যটিও লুকিয়ে যেতে লাগল মেঘের আড়ালো। কনকনে শীতের সঙ্গে ঝড়ের আভাসে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। সবাই ছুটল আপন ঘরের দিকে।



বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি লাইজু আমার পাশে। আমি বললাম, ‘তাড়াতাড়ি চলো!’ পুরো বিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমাদের দুজনের পথই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। আমরা হাঁটতে লাগলাম দ্রুত পায়ে—নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর তাড়নায়, অথচ বুকের ভেতর অকারণ কাঁপুনি নিয়ে।

মাইলখানেক পথ বাকি থাকতে আকাশ যেন হঠাৎ খুলে গেল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর প্রবল বৃষ্টি। লাইজু আমার গা ঘেঁষে হাঁটছিল। বুঝতে পারলাম, তার ভেতরে ভয় জমছে। একটু পর একটি তালগাছের নিচে এসে সে বলল, ‘ভাইয়া, এই গাছটার নিচে একটু দাঁড়াই না? কাছে তো কোনো বাড়িঘর নেই!’

অন্য কোনো উপায় ছিল না। তার স্কুলব্যাগটি আমার কাছে নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম শিলাবৃষ্টির বিপরীতে। হঠাৎ মেঘের প্রচণ্ড গর্জনে লাইজু ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে সাহস দিতে চাইলাম, কিন্তু নিজেই যেন কেঁপে উঠলাম সেই মুহূর্তের গভীরতায়।

তার ভেজা কাঁধ, শীতের কাঁপুনি আর ভয়ভরা নিঃশ্বাসের শব্দ আমার বুকের ভেতর এক অদ্ভুত মমতা জাগিয়ে তুলল। কোনো উচ্ছ্বল আবেগ নয়—বরং এক অদ্ভুত দায়িত্ববোধ, যেন পৃথিবীর সব ঝড় থেকে তাকে আগলে রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আমি তাকে বুকের কাছে টেনে বললাম, ‘ভয় পেয়ো না, আমি আছি!’

মনে হলো, আমার বুকে মাথা রেখে সে যেন কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনও বরছে, কিন্তু সেই বৃষ্টির ভেতর আমরা দুজন যেন পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম।

চার. যে কথা বলা হলো না

আমি গভীর স্নেহে ডাকলাম, ‘লাইজু, এই লাইজু!’ আমার ডাকে সে মাথা তুলে তাকাল। সেই চোখে ভয় ছিল, লজ্জা ছিল, আর ছিল এমন এক অচেনা আকুলতা, যার ভাষা কোনো অভিধানে লেখা থাকে না। সে তখনও শক্ত করে আমার হাত ধরে রেখেছে।

আবার ডাকতেই সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও আমার চোখের আবেগমাখা হাসি দেখে তার ফ্যাকাশে মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কাঁপা ঠোঁটে, লাজুক চোখে সে বলল, ‘ভাইয়া, এমন করেই আমায় ধরে রেখো যতদিন থাকব এই পৃথিবীতে রাখবে না?’

কথাটি শুনে আমার বুকের ভেতর যেন বজ্রপাত হলো। এই কি সেই অব্যক্ত ভালোবাসা, যার জন্য এতদিন হৃদয় অপেক্ষা করছিল? উত্তর দিতে চাইলাম—‘হ্যাঁ, রাখব।’ কিন্তু শব্দগুলো গলায় এসে আটকে গেল। না বলতে পারলাম, না হ্যাঁ বলতে পারলাম। শুধু তার মাথাটি আরও কাছে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে।

কিছু নীরবতা শব্দের চেয়েও বেশি সত্য। কিন্তু সে নীরবতা কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যথা হয়ে ফিরে আসে। সেদিন আমি যদি শুধু একটি শব্দ বলতাম—‘ভালোবাসি’—তবে হয়তো আমার বুকের ইতিহাস অন্যরকম হতো।



পাঁচ. বৃষ্টিভেজা পথ ও রক্তে লেখা চিঠি

আমাদের দুজনের শরীর প্রায় ভিজে গেছে। মাঘের হিমেল বাতাস আর প্রবল বৃষ্টির দাপটে ঠোট পর্যন্ত কাঁপছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টি কিছুটা কমল, কিন্তু বাতাস তখনও তীব্র। হঠাৎ একটি রেইনট্রি গাছের অর্ধেক ভেঙে এসে প্রচণ্ড শব্দে আঘাত করল পাশের তালগাছে। লাইজু ‘মাগো’ বলে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বুঝলাম, আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ঝড়ের মধ্যেই আমরা বাড়ির পথে ছুটলাম। লাইজুর শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আসছিল; সে নিঃশব্দে আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে লাগল। পিচ্ছিল পথে কয়েকবার পড়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরলাম নিজের ঘরে।

সেই রাতটি আর ঘুমের ছিল না। বারবার মনে পড়ছিল বৃষ্টিভেজা মুহূর্তগুলো, তালগাছের নিচে তার কাঁপা চোখ, আর সেই প্রশ্ন—‘রাখবে না?’ বুকের ভেতর অনুতাপের আগুন জ্বলতে লাগল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক তাকে জানাব—আমি তাকে ভালোবাসি, আজীবন ধরে রাখতে চাই।

অর্ধেক রাত জেগে একটি চিঠি লিখলাম। ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই হৃদয়ের ভেতর থেকে শব্দ তুললাম। এমনকি আবেগের তাড়নায় আঙুল কেটে রক্তের দাগও রেখে দিলাম চিঠির কোণে—কিশোর বয়সের সরল, বেপরোয়া, অথচ অগাধ ভালোবাসার অদ্ভুত সাক্ষী হয়ে।

ভোর হলে দরজা খুলে বাইরে এলাম। পূর্ব আকাশে আলো ফুটছে, মেঘের আড়াল থেকে দিনের প্রথম সোনালি রেখা উঁকি দিচ্ছে। মনে মনে বললাম—আজই তাকে জানাব, আমার জীবনের সবচেয়ে আপন মানুষ সে-ই।

ছয়. অসুস্থতার শয্যা ও অপ্রকাশিত চিঠি

রক্তে লেখা চিঠিটি পকেটে নিয়ে স্কুলের পথে বের হলাম। বাসস্ট্যান্ডে লাইজুকে না দেখে ভাবলাম, হয়তো আগেই চলে গেছে। কিন্তু স্কুলে গিয়ে জানলাম, সে আজ আসেনি। বুকের ভেতর হঠাৎ এক অস্বস্তি জেগে উঠল। বাড়ি ফিরে শুনলাম—লাইজুর প্রচণ্ড জ্বর। আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, ছুটে গেলাম ওদের বাড়ি।

দরজায় পা রাখতেই চোখে পড়ল—খাটের ওপর নিস্তেজ হয়ে শুয়ে আছে লাইজু। যে মুখ একদিন বৃষ্টির ভেতর লজ্জায় লাল হয়েছিল, আজ তা জ্বরের আঁচে ফ্যাকাশে। ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওর কী অবস্থা?’ তার মা অশ্রুসজল চোখে বললেন, ‘একই অবস্থা। গত রাত থেকে জ্বর। ডাক্তার আনা হয়েছিল, কিন্তু তেমন কাজ হয়নি।’

আমি সান্ত্বনার কথা বলার চেষ্টা করলাম। তার কপালে হাত রাখতেই লাইজু ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল। কোনো কথা বলতে পারল না। শুধু তার দুই চোখ বেয়ে নেমে এল পাহাড়ের নীরব কান্নার মতো অশ্রু। সেই চোখে আমি যেন দেখলাম—একটি অব্যক্ত ভালোবাসার শূন্য গ্যালারি, যেখানে কেউ কোনোদিন হাততালি দেয়নি, শুধু অপেক্ষা জমে আছে।



শিয়রের পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে চোখ বন্ধ করল। মনে হলো, আমার হাতের স্পর্শে সে একটু শান্তি পেলে। আমি বললাম, ‘ভালো থেকে। কাল সকালেই আসবা’ কিন্তু চিঠিটি আর দেওয়া হলো না। পকেটের ভেতর নিঃশব্দে রয়ে গেল আমার সমস্ত স্বীকারোক্তি।

সাত. স্বপ্নের ভিতর একটি মৃত্যুর পূর্বাভাস

সেই রাতটিও কেটে গেল তার ভাবনায়। শেষ প্রহরে চোখে ঘুম নেমে এলো। স্বপ্নে দেখলাম—একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আর চিঠি হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। লাইজু সুস্থ হয়ে আমার সামনে এসেছে। আমি তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম, তারপর চিঠিটি তার হাতে দিয়ে বললাম আমার অব্যক্ত ভালোবাসার কথা।

সব শুনে সে হঠাৎ হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেল। মুহূর্তে তার মাথা ফেটে রক্ত বরতে লাগল। আমি ডাক্তার আনতে ছুটলাম। পথে বিশাল এক সাপ আমাকে তাড়া করল। ভয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি—লাইজু আর নেই; পৃথিবীর সমস্ত মায়া ছেড়ে সে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে।

স্বপ্নের সেই করুণ দৃশ্য দেখে ‘লাইজু, লাইজু’ বলে চিৎকার করতেই ঘুম ভেঙে গেল। বুক ধড়ফড় করছে, শরীর কাঁপছে। মা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছে?’ আমি কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু নিজেকে বোঝাতে লাগলাম—স্বপ্ন তো স্বপ্নই, সত্যি নয়। অথচ ভোরের আকাশ সেদিন অকারণ ভারী লাগছিল।

আট. শেষ সংবাদ

সেদিন ভোরের পাখির ডাকেও আর মন জাগল না। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যও যেন চোখে ধরা দিল না। বিষণ্ণ মনে বাইরে আসতেই দেখি লাইজুর ছোট ভাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী খবর, নুরুল?’

সে কোনো উত্তর দিল না; শুধু কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে মনে হলো, এই পাষণ্ড পৃথিবী হয়তো সত্যিই ধরে রাখতে পারেনি আমার লাইজুকো। তবু হৃদয় বিশ্বাস করতে চাইছিল না। কারণ ‘ভালোবাসি’—এই কথাটি তো এখনও বলা হয়নি!

আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। ছুটে গেলাম তাদের বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই শুনলাম করুণ সুরের কান্না। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না—আমার জীবনের সবচেয়ে মায়ারী সকালটি অন্ধকার হয়ে গেছে। লাইজু চলে গেছে। যে পৃথিবীতে তাকে ধরে রাখার জন্য আমি একদিন কোনো উত্তর দিতে পারিনি, সেই পৃথিবীও তাকে ধরে রাখতে পারল না।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, বুকের ভেতর কেউ যেন নীরবে একটি দরজা বন্ধ করে দিল। পকেটে তখনও সেই চিঠি—অপ্রকাশিত, অপঠিত, অমরা।



নয়. সমাধির পাশে অব্যক্ত স্বীকারোক্তি

ব্যথাভরা হৃদয়ে, চোখের জলে ভেজা তিন মুঠো মাটি রাখলাম তার সমাধিতে। যে হাতে একদিন তাকে আশ্বাস দিতে পারিনি, সেই হাতই আজ তার বিদায়ের মাটিতে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, প্রতিটি মুঠো মাটির সঙ্গে আমার বুকের ভেতর থেকে একেকটি স্বপ্ন ঝরে পড়ছে।

সেই দিন থেকে আজও, যখনই তার সমাধির পাশে দাঁড়াই, মনে হয়—লাইজু হয়তো বাতাসের ভেতর কোথাও আছে। হয়তো সে শুনছে আমার অব্যক্ত স্বীকারোক্তি। হয়তো সে জানে, আমি তাকে বলতে পারিনি, কিন্তু ভালোবাসিনি তা নয়।

কবরের নীরব মাটির কাছে দাঁড়িয়ে আজও করুণ সুরে বলে যাই—

‘হয়তো কোনো একদিন শুকিয়ে যাবে নীল সাগরের পানি,

কোনোদিন ভাবিনি লাইজু, তুমি হবে এমন পাষাণী’

আসলে সে পাষাণী ছিল না। পাষাণ ছিল সময়, পাষাণ ছিল আমার নীরবতা। একটি শব্দের অভাবে যে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি, সেটিই আজ আমার জীবনের দীর্ঘতম কবিতা হয়ে বেঁচে আছে। ভালোবাসা কখনো কখনো বলা হয় না; কিন্তু না-বলা ভালোবাসাই কখনো কখনো হৃদয়ের গভীরে সবচেয়ে বেশি জেগে থাকে।

উপসংহার: যে কথার কোনো মৃত্যু নেই

প্রথম ভালোবাসা সবসময় মিলনের গল্প নয়; কখনো সে হয়ে ওঠে না-বলা কথার স্মৃতি, না-পৌঁছানো চিঠির দীর্ঘশ্বাস, আর ভেজা মাটির ওপর রেখে আসা তিন মুঠো ভালোবাসা। লাইজু চলে গেছে, কিন্তু তার হাসি যায়নি। তার সেই ভেজা বিকেলের চোখ, তার কাঁপা কণ্ঠের অনুরোধ, আর আমার পকেটে অপ্রেমিত চিঠি—সব মিলিয়ে সে আজও আমার ভেতরে বেঁচে আছে।

সময়ের স্রোত অনেক দূর নিয়ে যায় মানুষকে, কিন্তু কিছু নাম হৃদয়ের পাড় ছেড়ে যায় না। লাইজু সেই নাম—যাকে ভালোবাসি বলা হলো না, অথচ যার জন্য ভালোবাসা আজও শব্দহীনভাবে জ্বলে আছে।

— সমাপ্ত —